

প্রশ্ন : সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে জয়দেবের অবদান আলোচনা করা

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে দ্বাদশ শতকের কবি জয়দেব এক অত্যন্ত উজ্জ্বল ও স্বকীয় নক্ষত্র। বিশেষত মধ্যযুগীয় ভারতীয় প্রেমমূলক ও ভক্তিমূলক গীতি কাব্যের বিকাশে তাঁর অবদান অনন্য। লক্ষ্মণসেনের রাজসভার 'পঞ্চরত্ন'-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন হিসেবে জয়দেব বৈষ্ণব পদাবলী এবং ভারতীয় সঙ্গীত ধারায় এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত অমর সৃষ্টি 'গীতগোবিন্দম্', যা তাঁকে সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে স্মরণীয় করে রেখেছে।

জয়দেবের পরিচয় ও সময়কাল :

অনুমান করা হয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ (রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল, আনুমানিক ১১৭৯-১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ)। বীরভূম জেলার অন্তর্গত অজয় নদীতীরের কেন্দুবিষ্ণু (বর্তমান কেঁদুলি) গ্রামকে কবি জয়দেবের জন্মস্থান বলে মনে করা হয়। তিনি বাংলার সেন বংশের শেষ স্বাধীন নরপতি লক্ষ্মণসেনের রাজসভার পঞ্চরত্নের (উমা পতিধর, শরণ, ধোপ্তা, গোবর্ধন ও জয়দেব) প্রধান কবি বা রাজকবি ছিলেন।

প্রধান কৃতি :

জয়দেবের অবদানের কেন্দ্রবিন্দু হলো তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'গীতগোবিন্দম্'। এটি মূলত একটি গীতি-কাব্যালয় বা 'সংগীত-রূপক'।

কাব্যের বিষয়বস্তু :

কাব্যটির মূল প্রতিপাদ্য হলো শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার অপ্রাকৃত প্রেমলীলা, রাধার বিরহবেদনা, সখীর মধ্যস্থতা, কৃষ্ণের অনুশোচনা এবং পরিশেষে রাধা-কৃষ্ণের মিলন। সমগ্র কাব্যটি ১২টি সর্গে বিভক্ত। এতে ২৪টি গীতি বা 'প্রবন্ধ' রয়েছে, যা বিভিন্ন রাগ ও তালায় নিবদ্ধ। কাব্যের সূচনায় বিষ্ণুর দশটি অবতারের (মৎস্য, কচ্ছপ, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কঙ্কি) সুনির্দিষ্ট স্তুতি সংস্কৃত সাহিত্যে অবতারবাদের একটি সুস্পষ্ট রূপায়ণ প্রদান করে।

জয়দেবের অভিনবত্ব :

১) শৃঙ্গার ও ভক্তির অভূতপূর্ব সমন্বয় : জয়দেবের পূর্বে সংস্কৃত গীতি-কাব্যে প্রেমের চিত্রায়ন ঘটলেও (যেমন কালিদাসের মেঘদূত), তাতে অলৌকিক বা ব্যাকুল ভক্তির সংমিশ্রণ ততটা স্পষ্ট ছিল না। জয়দেব শৃঙ্গার রসকে (লৌকিক প্রেম) ভক্তি রসে (অপ্রাকৃত প্রেম) রূপান্তর করেন। তাঁর কাব্যে রাধা ও কৃষ্ণ কেবল মাত্র লৌকিক নায়ক-নায়িকা নন, বরং আত্মা ও পরমাত্মার রূপক।

২) গীতি-কাব্যের নতুন ধারা ও ছন্দ-লালিত্য : জয়দেব ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃত ছন্দের বাইরে গিয়ে লোকায়ত সংগীতি বা 'প্রবন্ধ সংগীতি'র রীতি সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবর্তন করেন।

৩) কাব্যের ভাষা : তাঁর কাব্যের ভাষা অত্যন্ত কোমল, মধুর এবং সুরময়। একে বলা হয় 'কোমলকান্ত পদাবলী'। অন্ত্যমিল ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি সংস্কৃত কবিতায় এক অভাবনীয় ধ্বনিমাধুর্য এনেছিলেন, যা ধ্রুপদী সংস্কৃত কাব্যে বিরল ছিল।

৪) বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনের ভিত্তি স্থাপন : জয়দেবকে পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ বলা চলে। তাঁর গীতগোবিন্দে প্রথম রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা এত প্রাঞ্জল ও সমৃদ্ধভাবে আল্পপ্রকাশ করে। শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁর অনুগামী গোড়ীয় বৈষ্ণব রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী প্রমুখ জয়দেবের ভাবধারা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। শ্রীচৈতন্যদেব প্রতিদিন গীতগোবিন্দ আশ্বাদন করতেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে।

৫) সঙ্গীত ও নাট্যকলা : গীতগোবিন্দ কেবল পাঠ্য কাব্য নয়, এটি একটি দৃশ্য-শ্রাব্য শিল্প। প্রতিটি পদেই সুনির্দিষ্ট রাগ (যেমন: ভৈরব, রামকিরী, বসন্ত, মালব) এবং তাল (যেমন: একতালী, রূপক) নির্দেশ করা আছে। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত (হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটকী উভয় ধারা) এবং ধ্রুপদী নৃত্যরীতির (যেমন ওড়িশা, মণিপুরী ও কথাকলি) বিকাশে গীতগোবিন্দমের প্রভাব অপরিমিত।

৫) অলংকার প্রয়োগ : অনুপ্রাস, উপমা ও রূপক অলংকারের চমৎকার ও স্বাভাবিক প্রয়োগ জয়দেবের কাব্যকে অভিনব দান করেছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে জয়দেবের অবস্থান এক অনন্য মোড়কে চিহ্নিত করে। তিনি একদিকে ধ্রুপদী সংস্কৃতরীতির জটিলতা ও আড়ম্বরকে ভেঙে সহজ-সরল গীতিকবিতার সৃষ্টি করেছেন, অন্যদিকে সাহিত্যের আঙিনায় প্রেম ও ভক্তির এক অপূর্ব সুসমা মূর্ত করে তুলেছেন। তাঁর রচিত 'গীতগোবিন্দম্' কাব্য বাংলা, ওড়িয়া, মৈথিলী ও ব্রজবুলি সাহিত্যের ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছে। তাই প্রাচীন সংস্কৃত গীতি-কাব্যের ধারায় কবি জয়দেব চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।